কবি নরেশ গুহর

জাতে ধাতে আলাদা একতোড়া লেখালেখির গদ্য নিয়ে

সত্য গুহ

আমাদের আলোচনার বিষয় কবি নরেশ গুহর গদ্য। কিন্তু এ গদ্য উপন্যাস - গল্পের গদ্য নয় — এ গদ্য পরপ্রতিভা - সঞ্জাত শিল্পের প্রতি ভালোবাসা নিবেদনের মাধ্যম একান্তভাবে কবির গদ্য। রচনাকার কবির কথায়, ''নানা সময়ে এই সব গদ্য রচনার বিষয় মূলত কবিতা ও কাব্যনাট্য, ভাষার অন্তরালে যার ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি অবিরাম আমাদের উন্মনা করে।'' এই সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি, নরেশ গুহর গদ্য রচনাগুলো আমাদের অতি চেনা তত্ত্ব-তথ্যের প্রাচুর্য ভরা যৌক্তিক পারম্পর্যের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যথার্থ প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত নয়। লিখতে গিয়ে তিনি কোথাও নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেননি। বস্তুগত এবং যৌক্তিক পারম্পর্য রক্ষার দায় তাঁর নেই। তিনি তাঁর গদ্য রচনায় নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগাকেই প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্যের ঢঙ ও রসকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন বেশি। নিজের ভালোলাগা - মন্দলাগার কারণ উপস্থিত করার জন্যে যতটুকু অনুসন্ধান ও তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশনা প্রয়োজন বোধ করেছেন, তাই আশ্চর্য রসায়নের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করে পাঠকদেরও তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে ভাবতে উদ্দীপিত করেছেন।

আমরা মনে করি, তাঁর রচনাগুলো প্রায় সবই রসশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে আছে কবিতার রস, দার্শনিকতা, স্মৃতি কথা, মিহি তির্যকতা, চাপা হাসির ছটা এবং বহুবহু পাঠক্রিয়ার নিদর্শন। পরিশীলিত, উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে প্রতিটি বাক্যকে লক্ষ্যমুখি করে তুলেছেন তিনি। সরল, ঋজু তাঁর গদ্যভাষা কোথাও এলিয়ে পড়েনি। যেখানে শক্ত কথাও বলেছেন, সেখানেও, লক্ষ্য করার মতো, তিনি বাক্যকে করে তুলেছেন শিল্প। তর্ক এড়িয়ে যাননি, করেননি তথ্য ভারাক্রান্ত। সহজ সচ্ছন্দ বাক্ ভঙ্গিমায় অনেক কঠিন বক্তব্যকেও কবি নরেশ গুহ, পাঠককে বিব্রত না - করে লীলা - রসায়িত করে পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের চিহ্ন আছে, কিন্তু তা তানপ্রধান, না, প্রাণপ্রধান বাক্ভঙ্গীমায় সরল সহজভাবে পরিবেশিত হয়ে পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছে এবং তাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে উন্মুখ করেছে।

বহু পাঠক্রিয়াজাত পাণ্ডিত্য আছে নরেশ গুহ-র গদ্য রচনাগুলোতে। আছে ব্যক্তিগত আবেগ। সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় এবং কবিতাকে বিশুদ্ধ বোধের সামগ্রী বলে বিশ্বাসে তিনি যেমন কবির ভেতর - বাইরেটাকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেছেন, তেমনি তাঁর সৃষ্টি বাক্শিল্পকেও দেখতে চেয়েছেন ভাষা - ছন্দের আড়াল থেকে বের ক'রে এনে—পেতে চেয়েছেন শুদ্ধ ধ্বনিটিকে যা কবিতাকে করে অমৃত।

কবিতার মানুষ নরেশ গুহ। তিনের দশকে যে - সব কবি বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে - যতদূর সম্ভব তরলতা বর্জন করে শব্দ প্রতিমা তৈরি করে রবীন্দ্র - অন্য কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন, তিনের দশকে সেই সব মুখ্য কবি, অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ -এর সচেতন, সংযত, শ্রদ্ধাবনত কবিতা - বিদ্রোহের আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে নরেশ গুহরও কবি মানস। প্রতিষ্ঠিত ছন্দ - যতিকে মান্য করেই সচেতন শব্দ ব্যবহার করে সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত অন্তর্ধ্বনি প্রকাশে এনে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা - প্রভাবের গ্রাস থেকে মুক্ত থেকে স্বতন্ত্র জাতের কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁদের স্বতন্ত্রতার আন্দোলন বিশ্বকবির মধ্যেও একটা খট্কা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। ভাঙেন তো মচকান না। নিজেকে দুখান করে এক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য রবীন্দ্রনাথকে লড়িয়ে দিয়ে কবিতার কাছাকাছি গদ্যে রচনা করলেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাস - রবি ঠাকুরের প্রতিপক্ষ কবি নিবারণ চক্রবর্তী ওরফে কবি অমিত রায়কে প্রায় ধ্বসিয়ে দিলেন। 'শেষের কবিতা' হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের ভাবছন্দে লেখা 'পুনশ্চ' ও অন্যান্য গদ্য কবিতা - গ্রন্থগুলোর নান্দীমুখ। কবি নরেশ গুহ রবীন্দ্র - বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ সমর্থনের নজির 'শেষের কবিতা' উপন্যাস তথা কবি অমিত রায়ের চরিত্র - চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :

''আমি এ কথাও বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গদ্যঋতুর শুরু হয়েছে 'পরিশেষ' কিংবা 'পুনশ্চ' থেকে নয়, তারও আগে 'শেষের কবিতা' থেকে, যেটি শুরু হয় ১৯২৮ -এর মে - জুন মাসে। তারও আগে 'লিপিকা'য় অবশ্য এই বসন্তেরই একটি দলছাড়া পাখি একবার গেয়ে নীরব হ'য়ে গিয়েছিলো। 'লিপিকা'র মতো 'শেষের কবিতা'য় পৌঁছেও পদ্যের ছন্দমিল - ঝরানো এই শ্রেণীর রচনাকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অসংকোচে একেবারেই কবিতা ব'লে স্বীকার করতে পারেননি। হয়তো তার জন্য 'কল্লোল', 'প্রগতি'র পক্ষ থেকে নবীন কবিদের বিরোধিতা এবং বিদ্রোহের দরকার ছিলো। তাঁদের সেই বালখিল্য বিরোধিতা খুবই নিশ্চয়ই বিচলিত করেছিলো রবীন্দ্রনাথকে।''

প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ রবীন্দ্রনাথ ও নবীন কবিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের জটিল দিকটি অজটিল গদ্যভাষায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন : ''রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বিদ্রোহকে স্বীকার করলেন না, তবে নিজের রচনায় এই পর্যন্ত মেনে নিলেন যে কাব্যের অধিকারকে আরো অনেকটা বাড়ানো সম্ভব। 'তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো - গোল বা তরঙ্গ রেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে' — অমিত রায়ের মুখ দিয়ে বিদ্রোহীদের অতৃপ্তিকে এইভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। যে তারই লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্যে 'পুনশ্চ'র প্রবেশ। এখানে মিলিয়ে গেলো আগেকার ছন্দমিলের ঝঙ্কার। কবিতার ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি এনে বৃহৎ গদ্য পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে অঙ্গীকার ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথ।''

রবীন্দ্র সমসমায়িক অনুজ অর্থাৎ তিনের দশকের বিদ্বান - বুদ্ধিমান কবিদের বিদ্রোহকে তুচ্ছ - তাচ্ছিল্য করার মতো গোঁড়ামির মানসিকতা না - রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের তাঁর লেখালেখির প্রতি বিরূপতার কারণগুলো অনুসন্ধানে ধ্যান দিয়ে নবীন কবিদের অনেকখানি নেনে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে জানালেন, ''কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্যন্ত।'' এই রাবীন্দ্রিক নমনীয়তাকে ধরে কবি - আলোচক

নরেশ গুহ লিখলেন : ''নিজের কবিধর্মে অবিচলিত থেকেও নিজেকে তিনি বিবর্তিত করলেন ঠিকই, কিন্তু নতুন কবিতার প্রতি সন্দেহ তাঁর কিছুতেই গেলো না। মনে হ'লো কড়া ভঙ্গির চমক লাগানো দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছু দেবার নেই তাদের। এ দ্বন্দ্বের ইতিহাস 'শেষের কবিতা'র পাতায় প্রচ্ছন্ন আছে। 'শেষের কবিতা'কে তাই অনায়াসে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্বে রচিত কবিতাবলির মুখবন্ধ।''

ডি. এল. রায় - বিপিনচন্দ্র পাল থেকে রবীন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত রবীন্দ্র বিরোধিতার দীর্ঘ ইতিহাসটা, এক্ষণে, নাবালক - সাবালক সকলেরই জানা। কেউ কেউ ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন কুৎসিত ভাবে, কেউ কেউ করেছেন ছাপার কালিতে রবীন্দ্র কাব্যাদর্শকে কলঙ্কিত। তাঁদের সে বিরোধিতা এমন গুরুত্বহীন যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁদের পাওনা হয়েছে কেবল উদাসীন উপেক্ষা। কিন্তু তিনের দশকের কবিদের যে আন্দোলন, তার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেই তিনি গুরুত্ব দিয়ে তরুণ কবিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন সরাসরি এবং 'শেষের কবিতা' উপন্যাস রচনা করেছেন তার জবাব হিসেবে। নিজেকে খানিকটা বদলাতেও চেষ্টা করেছেন। কবি নরেশ গুহ এই দ্বন্দ্ব পর্বকে আন্দোলনকারীদের মিছিলের লেজে-মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়ে বিদ্রোহের চরিত্রটা স্পষ্ট যেমন বুঝেছেন ও অনুভব করেছেন, তাকেই বক্তব্য 'আধুনিক কবি অমিত রায়' নিবন্ধে। এ নিবন্ধের গদ্যে যেমন আছে দৃঢ়তা তেমনি তা প্রত্যয় সঞ্জাত। তিনি জানালেন : 'শেষের কবিতা'র ''অনেকটাই যে রাবীন্দ্রিক গদ্য কবিতার খসড়া তাই শুধু নয়, আধুনিক কবিদের তিনি কীভাবে বুঝেছিলেন, তাদের প্রতি কী মনোভাব ছিলো তাঁর, -সে সব কথা এতটা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ গোচর ক'রে আর কোথাও বলেননি। ঐখান থেকেই আধুনিক - রবীন্দ্রনাথ আর নবীন কবিদের পথ দুইদিকে ভাগ হ'য়ে গেলো। 'শেষের কবিতা'র মূল্য সে-কারণেও অপরিসীম।''

আলোচক কবি নরেশ গুহ যুক্তির সঙ্গে অনুভব মিশেল দিয়ে 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের আর্থ - সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা - মর্জি - আচরণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ''শেষের কবিতা' উপন্যাসে 'রবিঠাকুরে'র প্রতিপক্ষ, নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্মনামে, অমিত রায়। এবং 'শেষের কবিতা'র আনন্দলোক থেকে আমরা যেটুকু অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসি তার জন্য অমিত রায়ই দায়ী। কবি হিশেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই। আধুনিক কবি তো সে নয়ই, এমনকি আদৌ সে যে কবি তাও রবীন্দ্রনাথেরই দয়ায়।''

নরেশ গুহ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আধুনিক কবিতা ও কবিতাকারদের যে সমস্যা ও সংশয় দেখা দিয়েছিলেন, তার একটা জুৎসই ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ দিয়ে, কোনো তরফকে ক্ষুণ্ণ না - করে, সে সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন, তা পাঠকদের পক্ষে একটা স্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। 'শেষের কবিতা'র কবি অমিত রায় তথা নিবারণ চক্রবর্তী সম্পর্কে শেষ কথা বলতে গিয়ে নরেশ গুহ একটু তির্যকোক্তিতে জানিয়েছেন : ''অমিতর নির্জলা যৌবনের বিদ্রোহী আধুনিকতা শেষ পর্যন্ত'' টিকলো না - অমিত রায়ের বানানো আধুনিক কবি নিবারণ চক্রবর্তী 'বেচারা মরেছে', সে 'রবিঠাকুরে'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র কবিতাকেই ভর করে আত্মপ্রকাশের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ রচিত কবি অমিত রায় প্রসঙ্গে নরেশ গুহ-র মন্তব্য, ''এই চরিত্রের জন্য এমন আশ্চর্য রচনা (শেষের কবিতা) যেন ঐশ্বর্যের বাজে খরচ। আধুনিক বাঙালি কবির প্রতি অতটা নিষ্করণ না -হলেও পারতেন রবীন্দ্রনাথ।''

'শেষের কবিতা' —উত্তর 'পুনশ্চা'দির মধ্যে থেকে যে আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন, তাঁকে স্বীকার ক'রে নিয়েই বিদ্রোহী নবীন কবিরা রবীন্দ্র—অন্য কবিতা রচনা করে নিজনিজ অভিব্যক্তি (এ্যাটিটিউড) প্রকাশ করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট হলেন। আর ইতিহাস বললো, তরুণ প্রজন্মের বিরাগটা বিশ্বকবির ওপর ছিলো না— ছিলো রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু বানিয়ে যে ভক্ত কবিদল তাঁকে অন্ধ অনুকরণ ক'রে পানসে পদ্য রচনা ক'রে পথে বসাচ্ছিলেন, তাঁদের ওপর। খটাখট শব্দ বুনে বিস্তর কারদানি দেখানো কবিকুলকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেননি তাঁরা — রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়েই তাঁরা কবিতার ধমনিতে যোজনা করলেন উত্তর - রাবীন্দ্রিক পৌরুষ।

কোথাও একথা স্পষ্ট করে না বললেও বিভিন্ন প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় নরেশ গুহ এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সচিব' অমিয় চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার সময় থেকেই তিনি 'বিশ্বের পথিক'। ''তার প্রথম ফুলফল দেখা দিলো 'একমুঠো' আর 'খসড়া'র কবিতাগুচ্ছ, যা দেখে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে যে এতকালের রবিবৃত্ত থেকে তিনি বুঝি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হলেন। সেটা যে ঠিক নয় তা আজ কারো কাছে অবিদিত নেই। তবে একথা ঠিক যে তাঁকে নিতান্তই রবিমণ্ডলীর অন্তর্গত বলা, আর তাঁর জীবনে ও কাব্যে ফল্গুধারার মতো ঐতিহ্যের অবিরাম স্রোতকে দেখতে না-পাওয়া — একই ভ্রান্তির এপিঠ - ওপিঠ।''

''খসড়া' (১৯৩৮) বেরুনো মাত্র তাঁকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবি' বলে মেনে নিয়েছিলেন সমসাময়িকরা। বুদ্ধদেব বসু সানন্দে ঘোষণা করেছিলেন : 'বিস্ময়কর বই ...একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব।... তাঁর ছন্দের তির্যক গতি, অদ্ভুত শব্দ - যোজনা, দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব সমস্তই নিবিড় মননের ফল। ... তাঁর কাব্যের সমস্ত উপমা ও রূপক আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তাঁর কল্পনার পরিভাষা বিশেষ ভাবেই এ-যুগের।'

''রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় তাৎক্ষণিক প্রশংসা পাঠ ক'রে, লিখেছিলেন : 'বুদ্ধদেবের সমালোচনা পূর্বেই পড়েছি — সে তোমাকে তাদের দলের বেদীতে বরণ করার উৎসাহ প্রকাশ করেছে। দরকার ছিলো কেননা সম্প্রতি সে ঘোষণা করেছে আমার সময় চলে গিয়েছে। এখন ভগ্নাবশেষের উপর তাদের সৃষ্টি রচনার জন্য রাজমিস্ত্রীর কাজে তোমাকে পেয়েছে বলে তারা আশ্বস্ত।'' অথচ অভিমানী বিশ্বকবিকে অমিয় যক্রবর্তী তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'একমুঠো' উৎসর্গ করতে চাইলে তিনি আপত্তি না - জানিয়ে লিখলেন, ''কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই।... আধুনিক মনোলোকে কাব্যের প্রকাশ রহস্য আমি বোঝবার চেষ্টা করছি - যেখানে আবির্ভাব কৃত্রিম নয়, সেখানে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে — অভ্যাসের বাধাকে একান্ত ভাবে মানলে ভুল হবে।'' এর সঙ্গে নরেশ গুহর সংযোজন : ''নিজের কবিতার সঙ্গে এসব হালআমলের কবিতার উপাদানগত প্রভেদ অথচ অন্তর্লীন গূঢ় মিলের

সূত্র রবীন্দ্রনাথ ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন। নিজের কবিতাকে তাঁর মনে হয়েছিলো ‘দূরে পাহাড়ের শিখরের নীলিমার ভিতর থেকে’ দেখা স্বচ্ছ নির্মল সূক্ষ্ম আলোর ছায়ায় রচিত নির্ঝরের মতো। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে তিনি দেখেছিলেন ‘সৃষ্টির সর্বগ্রাহী লীলা’। ‘আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়, আমি এখানে নামতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিনী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছো, তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও না কোথাও মিল আছে।”

প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিয়ে কবি নরেশ গুহ তাঁর প্রবন্ধে কবিতা - কবি - নাট্যকবিতা অর্থাৎ কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত যা - কিছু তাই নিয়েই তাঁর অভ্যন্তরে জেগে ওঠা ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে একান্ত নিজস্ব গতিময় গদ্যে পরিবেশন করেছেন। এসব গদ্যে তাঁর দূরবিস্তৃত পাঠক্রিয়ার পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের মুন্সিয়ানা। কোথাও আছে পাঠক্রিয়ায় ছাত্র - পাঠককে উদ্দিপ্ত করার গদ্য - চাল, কোথাও আছে তার্কিকের কথন, কোথাও সমস্যা উস্কে তুলে সমাধানের প্রচেষ্টা এবং তা পাঠককে সঙ্গে নিয়েই, আর আছে সম্মান - সম্ভ্রম - ভালোবাসাময় কবি - ব্যক্তিত্বের ছন্দিত গদ্য। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনের দশকের কবিদের যে সমস্যা, তা ‘আধুনিক কবি অমিত রায়’ নামের রচনায় তিনি — নরেশ গুহ ঘনিষ্ঠভাবে জেনে অনুভূতি - সজাগ গদ্যে আলোচনা করেছেন এবং বিষয়টা আমাদের এখনো ভাবায় বলেই বর্তমান লেখককে একটু দীর্ঘ আলোচনায় যেতে হয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখার, নরেশ গুহুর গদ্যের সৌন্দর্য ও শক্তি অন্য গদ্য রচনায় যেভাবে প্রকাশিত, তা পাঠকের কাছে সামান্যতম ভার বলে মনে হয় না - পাঠককে বন্ধু বানিয়ে লেখক তাকে প্রাচ্য - প্রতীচ্যের স্বনামধন্য গদ্য - পদ্য - নাটক রচয়িতাদের সাধনা - সিদ্ধি, দর্শন - ইতিহাস - সাহিত্যের বিষয়ে উৎসুক ও উন্মুখ করার মতো আলাপচারির ভাষা বুনে তন্নিষ্ঠ করে রাখেন।

কবি নরেশ গুহ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোনো প্রবন্ধ - নিবন্ধ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আপাদমাথা তিনি সাহিত্যের লোক, সাহিত্যের সঙ্গে যা কিছু - যার সম্পর্ক, তা নিয়েই তাঁর মনে - মেধায় আলোড়ন উঠেছে এবং তাকে তিনি কথকের চালে পরিবেশন করেছেন। তাঁর ‘অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি’ গ্রন্থে ‘আধুনিক কবি অমিত রায়’ ছাড়া আমরা পেয়েছি ‘রবীন্দ্রনাথ : ইমেজিজম : ইয়েটস’ ‘বাংলা কাব্য নাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও তুলনামূলক সাহিত্য’ —এগুলোকে বলা যায় তর্কবিতর্ক মূলক রচনা, এটা গ্রন্থের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে তিনি রেখেছেন ‘জীবনানন্দ দাশ’, ‘হেমন্তের কবি জীবনানন্দ দাশ’, ‘অমিয় চক্রবর্তী’র ‘পারাপার’, ‘অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যু’, ‘স্ত্রী চোখে কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ’, ‘সরোজনী দেবীর প্রয়াণে’ —এগুলোকে বলা যায় এ্যাপ্রিসিয়েশন বা লেখক - মনের সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি। তৃতীয় স্তরে তিনি রেখেছেন ‘শতবর্ষ পরে ওঅল্ট হুইটম্যান’, ‘ডিলান টমাসের অকালমৃত্যু’, ‘ইংরেজী কাব্যের বাড়ি বদল’, ‘শীতান্তিক জল্পনা’ —এগুলোকে বলা যায় সহৃদয় সামাজিকের অভ্যন্তর ধ্বনিজাল বোনা। আর চতুর্থ স্তরে উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তবী’ ‘দুঃসময়’, অমিয় চক্রবর্তীর ‘বৃষ্টি’ ও ‘মাটি’ এবং বুদ্ধদেব বসুর ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’ প্রভৃতি কবিতার নিবিড় পাঠক্রিয়ার ফলশ্রুতি — লেখক যাকে বলেছেন ‘বাণীময় অনির্বচনীয়’।

এছাড়াও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে, যেগুলি এখনো পর্যন্ত অগ্রন্থিত হয়ে আছে। তার মধ্যে আছে ‘আধুনিক বাংলা ভেরিওরাম’, ‘কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ’, ‘অমিয় চক্রবর্তী’র গদ্য’ ‘পাস্টেরনাকের প্রতিভা’, বাংলা লেখক - পাঠকের হয়ে সিগনেট প্রেস - এর সাহসী পরিকল্পক ডি. কে অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্তর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো রচনা ‘ঋণস্বীকার’ নামের নিবন্ধ, এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ঋত্বিক তথা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা কবি বুদ্ধদেব বসুর অসামান্য গদ্যে লেখা অসমাপ্ত ‘মহাভারতের কথা’ নিয়ে আলোচনা ‘একালের জন্য মহাভারত’। এইসব প্রবন্ধ বা আন্তর ধ্বনির প্রতিধ্বনি প্রকাশক লেখা ছাড়াও অগ্রন্থিত - অপ্রকাশিত বহু গদ্য লেখা যে কবি নরেশ গুহুর আছে, এমন অনুমান স্বাভাবিক।

আমরা কবি-আলোচক নরেশ গুহর যে কটি গদ্য রচনার নাম করলাম, সেই শীর্ষ নামগুলোই বলে দেয় শিল্প স্রষ্টার উপস্থাপিত শিল্পটির ভ্রূণ - চরিত্র থেকে শুরু করে তার রচনা - কৌশল, প্রকাশনা এবং তা পাঠকের মনে ও চেতনায় কী দ্যোতনা আনে বা আনতে পারে — বিশ্বের সাহিত্য ভাঁড়ারে তার সমান আর কি রচনা আছে, স্রষ্টার সঙ্গে অন্য সৃষ্টিকারের মানসিকতার কোথায় কতটুকু মিল এবং কোথায় অমিল তা অনুসন্ধিৎসু ছাত্রর মতো লেখক তল্লাস করে গেছেন এবং তাঁর অধীত জ্ঞানকে অকৃপণ ভাবে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন অন্য সহৃদয় সামাজিকদের মধ্যে। সাধারণ পাঠকেরা, যাদের লেখকের মতো অতিদূর ব্যাপ্ত জানার জগৎ নেই, —তারাও যেন লেখকের লেখার সঙ্গে চলতে চলতে বহু অজানার স্বাদ পেয়ে তাকে পুরোপুরি জানার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। পাঠকের মধ্যে জিজ্ঞাসা জেগে উঠে, উত্তর পাবার জন্যে তার মেধা ও মনকে সক্রিয় করে তোলে।

বিদ্বান নরেশ গুহুর বিভিন্ন বিষয়ের রচনাগুলোর বিষয় আলোচনা করার অবকাশ নেই এখানে। প্রতিটি গদ্য রচনাই ক্যানভাস বিরাট — যেখানে আলোচনা তুলনামূলক, সেখানে পাঠকেরও ব্যাপক পাঠক্রিয়ায় অভ্যস্ত থাকা চাই। তবু একটা কথা বলতে পারাই যায়, লেখকের লেখার গুণে, অতি গুরু গম্ভীর বিষয়ও তরতর করে পড়ে ফেলা যায় — পণ্ডিত্যের ওজন পাঠককে কিছুমাত্র ক্লেশ দেয়না।

তাঁর অনেকগুলো রচনাতেই আছে তুলনা - প্রতি তুলনা। তুলনাটা এসেছে রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে ইয়েটস, শেকস্পীয়র প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকদের। যেমন :

“১৯১২ সালে রটেনস্টাইনের অতিথি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লন্ডনের সাহিত্যিক মহলে সম্মানিত আসনের অধিকার পেলেন, ইমেজিস্ট আন্দোলনের ফুল তখন ফলে পরিণত হওয়ার কাল। ইয়েটস কখনোই প্রকাশ্যে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু স্বীয় সাহিত্য কর্মে এজরা পাউন্ডের কিছু উপদেশকে তিনি যে তখন অবজ্ঞা করছিলেন না সে কথা তো তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, যার ফলে এইসব থেকে রচিত তাঁর কবিতাবলীতে সুস্পষ্ট চিত্রকল্পের ঘনিষ্ঠ সংযম তখন - পর্যন্ত - অজ্ঞাত এলিঅট প্রমুখ ‘আধুনিক’ কবিদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো। এই সব ইয়েটসীয় নতুন কবিতার প্রথম সংকলনের নামই RESPONSIBILITIES (১৯১৪)। এখন কথা হচ্ছে, স্বীয় কাব্যের এই যে পুনর্জন্ম ঘটালেন ইয়েটস — তার জন্যে পাউন্ডের মধ্য দিয়ে ইমেজিস্ট আন্দোলন কতদূর ক্রিয়াশীল, এবং তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — কৃত ইংরেজি GITANJALI -রও কোনো হাত ছিলো কি না।

''...ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রধান আদর্শই ছিলো ভাষায় বাহুল্য বর্জন, ভূষণের পরিহার, যে-কারণে পাউন্ডের সেই বিখ্যাত মেট্রো স্টেশনের কবিতাটি তিরিশ পঙক্তির আলুথালু বেশ ছেড়ে মাস ছয়েকের মধ্যে দেড় পঙক্তির অখন্ড সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পেরেছিলো। অন্যপক্ষে এ কথাই বা কে না-জানে যে রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম প্রধান গুণই হচ্ছে তার অলংকারের মনোহারিত্ব। কবিতাকে নিরলংকার করা দূরে থাক, গদ্যের ভাষাকেও তিনি সদ্যবিবাহিতা বধূর মতো সালংকৃত করে তোলেন। এই কবির পক্ষে কী ক'রে তাহ'লে সম্ভব ইমেজিস্টদের কর্মকাণ্ডে মন্ত্রোচ্চারণ করা?

''তৎসত্ত্বেও আমি প্রস্তাব করছি যে এয়টসীয় কবিতার স্টাইলের পুনর্জন্মান্তরণে ইংরেজি GITANJALI-র প্রভাব অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। তার কারণ, বাংলার সঙ্গে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র সম্পর্ক দৈহিক মিলের নয়, প্রধানত তাদের আত্মিক মিলের; ভাষান্তরিত কবিতার দেহসৌষ্ঠব সেই পরিমানে নিরাভরণ যে - পরিমাণে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাবলী রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার অধিকাংশ কবিতার তুলনায় ভূষণ বিরহিত এবং স্বভাব সুন্দর; ইয়েটস -এর রবীন্দ্র মুগ্ধতার সেটাও ছিলো অন্যতম কারণ।'' এই সঙ্গেই উদাহরণে এসেছেন বোদলেয়ার, যিনি ''তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রভূত অংশ ব্যয় করলেন এডগার পো অনুবাদ ক'রে।'' এই তুলনাটা নরেশ গুহ এনেছেন 'প্রভাব' প্রসঙ্গে। তিনি বলতে চেয়েছেন, বড় কবি-লেখক 'অপর ভাষার মধ্যে দিয়ে' যা কিছু 'আবিষ্কার' করেন, তার উৎসস্থল 'আসলে তাঁর নিজের হৃদয়' — ইয়েটস- এর বেলাতেও হয়তো তেমনটিই ঘটে থাকবে।

আগেই বলা গেছে কবি নরেশ গুহর গদ্যের স্টাইল চলতে চলতে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করার মতো। বলতে বলতে বিষয়ের বেগ বেড়ে গেলে তিনি একটি হাঁ-বাচক বা না-বাচক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, যা থেকে পাঠক উত্তরটি ঠিক পেয়ে যান। যেমন:

''য়ুরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের ধারণা বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সুস্থির বোধ করতে পারেননি। প্রেমেই প্রেমের অন্তিম মূল্য একথা কখনো মনে হয়নি তাঁর। শকুন্তলায় তাই প্রেমের পরিণতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রেম এবং মিলনকে তিনি বলেছেন— 'পতন', 'পরাভব', 'ধূলা লাগা'। এটা হচ্ছে মানব স্বভাবের অন্তর্গত। কিন্তু তাঁর মতে, স্বভাবের অনুসরণে সাহিত্যের মুক্তি নেই, স্বভাব থেকে প্রেমের ধর্মে উত্তরণ দেখানোই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্বভাব - মিলনকে বলেছেন 'পূর্বমিলন'। 'উত্তরমিলন'। না দেখালে তাঁর স্বস্তি ছিলো না। এবং একথা শুধু যে কালিদাস বিষয়ে ভেবে বলেছেন তা নয়, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক লিখতে গিয়ে নিজেও 'পূর্বমিলন' আর 'উত্তরমিলনের'র রূপ দেখিয়েছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' এক হিশেবে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা।

''তা যদি হয় তবে তো শেক্স্পীরীয় প্রেম - চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো খানেই মিল হবার কথা নয়, কেননা শেক্স্পীয়রে কোথাও রবীন্দ্রনাথের অর্থে উত্তরমিলন নেই। প্রেম বিষয়ে এই ধারণা কি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই লক্ষণ? আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরও? নাকি ১৯২০ সালের পর থেকে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকেরা য়ুরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের ধারণাতেই মজেছেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিকেরা সাহিত্যিকদের বড়ো তফাৎ কি তা হ'লে এই যে আধুনিক স্বভাবপন্থী, আর রবীন্দ্রনাথ স্বভাব উত্তীর্ণ হওয়া আর এক ধর্মের পন্থী?

''শেক্স্পীয়রের সঙ্গে, যেমন য়ুরোপীয় অন্য কবিদের সঙ্গেও, আরো এক - জায়গায় বড়ো তফাৎ রবীন্দ্রনাথের। 'প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই, য়ুরোপীয় কবিগন যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন।' তুলনায় রবীন্দ্রনাথ সংযত, গম্ভীর, শান্ত। এখানেও তো আধুনিকদের সঙ্গে য়ুরোপেরই মিল। তাহ'লে কি বলা চলে আধুনিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট? তবে কি য়ুরোপ তার নিজের স্বভাববিরোধী বলেই এককালে রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে নত হ'য়ে বসেছিলো, এবং সেই একই কারণে বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি তাঁকে?

''এই সবই যদি ঠিক হয় তাহ'লে শেক্স্পীয়রের রচনা প'ড়ে যাঁরা মুগ্ধ হন তাঁদের পক্ষে কি রবীন্দ্রনাথ পড়েও সমপরিমাণ মুগ্ধ হওয়া সম্ভব? ভিন্ন স্বভাবের দুই কবিকে কি একসঙ্গে ভালোবাসা যায়? নাকি সাহিত্য আমাদের হৃদয় হরণ করে তার বক্তব্য দিয়ে ততোটা নয় যতোটা তার প্রকাশ ভঙ্গীর উৎকর্ষ দিয়ে? বক্তব্য-নিরপেক্ষভাবে আমরা সাহিত্যের রসাস্বাদন করি? 'চিত্রাঙ্গদা' যাঁর ভালো লাগে তাঁর পক্ষে কি ভালোলাগা সম্ভব Antony and Cleopatra? শেক্স্পীয়র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নগুলি কি আদৌ জরুরি বা জরুরি নয়?'' (রবীন্দ্রনাথ ও তুলনামূলক সাহিত্য)

এই যেমন তাঁর গদ্যের একটা ধরন, তেমনি নরেশ গুহর কিছু গদ্য আছে যা গদ্য - ছাঁদটা একটু বদলে দিলেই গদ্য - কবিতার ঢংটা পেয়ে যায়। যেমন :

''কখনো দুপুরে,
কখনো রাত্রির গভীরতায়,
তাছাড়া বিকেলের দিকে,
নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিলো।
শহরের পাকচক্রের মানুষী ভিড়,
হৈ - হট্টোগোলে বিলি কেটে,
হাঁটুর নিচে ধুতিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধ'রে,
আড়চোখে তাকাতে তাকাতে
(তিনি) চলে যেতেন
খুব কম লোকে চিনতে পারতো।
ইঁনি জীবনানন্দ দাশ।
দেখা হ'লে
একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন,

বা অন্যমনস্ক কথা বলতেন
দুচার মিনিট, রাশবিহারী এভিনিউ-
ল্যান্সডাউনের মোড়ে দাঁড়িয়ে।"

—'জীবনানন্দ দাশ' নিবন্ধে যেমন কাটা কাটা কথায় ধীর -মন্থর ছন্দোময় গদ্য, তেমনি 'সরোজিনী দেবীর প্রয়াণে', 'শীতান্তিক জল্পনা' (এলিয়ট নিয়ে আলোচনা) এবং আরো সব শক্ত বিষয়ের প্রবন্ধে তাঁর গদ্যের এই ধাঁচটি দুর্লক্ষ নয়। কবি নরেশ গুহ-র শক্ত - শক্ত বিষয়ের গদ্যেও ভার নেই, ধার আছে তীব্র, যে-ধারে চিকচিক করে ঠোঁটের কোণায় বক্র - বিদ্রুপ হাসি জাগানো। 'কবিতায় উত্তর - আধুনিক' প্রবন্ধটির সর্বাঙ্গে ব্যাঙ্গত্মক বাচনভঙ্গি —কখনো কখনো কিছুটা চাবুকের মতো কাজ করেছে। একটু উদাহরণ :

''আমি বাংলাদেশের কবিতার হাওয়ায় মানুষ, আধুনিক কবিতা যেখানে ঘটনা - চক্রে আমারি সমবয়সী। কৈশোর থেকেই শুনে আসছি, আধুনিক কবিতা নামক বাংলা সরস্বতীর এই সন্তানটি অতি কুসন্তান, সদ্বংশজাত নয়। বহু কটুক্তি ধিক্কার সহ্য ক'রে তবু সে-বেচারা, দেখা যাচ্ছে, টিকে গেলো। তার গুণ গৌরব চরিত্র লক্ষণ এবং কুল পরিচয় নিয়ে গবেষণা করলে আজকাল ডাক্তার উপাধি পাওয়া যায়। এমন কি সেই উড্ডীয়মান কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ছুতো ক'রে যে-কারো পক্ষেই আজ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সমীপবর্তী আকাশে বাণী ছড়িয়ে আসাও সম্ভবপর।

''কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। বাংলা কবিতারো নাকি দিন বদলাচ্ছে। জনরব শোনা যাচ্ছে যে চল্লিশ না - পোরোতেই সেই আজন্মাধিকৃত আধুনিক বাংলা কবিতার বুঝি ভাতজল ঘুচলো। উনিশশো পঁচিশ সালের পূর্বে জন্মেছেন যে-কবিরা, শুনে রাখুন — আবিষ্কার করা গেছে যে সুলিখিত পদ্যের অতিরিক্ত কিছুই আসলে আপনাদের দেবার ছিলো না। আপনাদের এতে উল্লসিত হওয়াই উচিত, কেননা আপনাদের বিরুদ্ধে এতদিন ধ'রে জনরব চ'লে আসছিলো যে ছন্দে মিলেই আপনাদের আসল গলদ। সে-উল্লাসও অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হ'তে চলেছে। পঞ্চাশ সালের কাছাকাছি এসে গাঁটের সেই কড়িও বেবাক খরচা হয়ে যাওয়ায় আধুনিক বাংলা কবিতা কাজেই নিরন্ন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এর পরেই বোধ করি প্রলয়। কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই। প্রলয়ান্তিক নব-মন্বন্তরের নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে অপাপবিদ্ধ 'আরো আধুনিক' বাংলা কাব্যের যে-সব কলি ফেরানো হবে তার খসড়া চক্ষুষ্মান পাঠকগণ এখন থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। রীতিমতো রোমাঞ্চকর উপসংহার এই - গল্পটির।"

এ-প্রবন্ধেই প্রসঙ্গক্রমে এসেছে জন ওয়েইন-কৃত সংকলন ও তার ভূমিকার কথা। সেটিকে ধ্বসিয়ে দিতে গিয়ে প্রবন্ধকার বলেছেন, ''...এই উত্তর আধুনিক কাব্যের কীর্তি - স্থাপন করেছেন সম্পাদকেরই সমকালীন কবিকুল। যে সব সামান্য গুণে এদের কবিতা ভূষিত তা হচ্ছে এই : আধুনিক কবিদের তুলনায় এঁরা নাকি কবিতার গঠন পারিপাট্যে অধিক মনোযোগী, অর্থাৎ এঁরা ফ্রি - ভার্স লেখেন না, সনেট ওড বা চিরকালীন চেহারার লিরিক লেখেন; এঁদের কবিতা সরবে অর্থাৎ বেতারে কিংবা কবিমেলায় পাঠ করবার উপযোগী; এবং এঁদের সরল সিধে বক্তব্যের মধ্যে আদৌ কোনো ঘোরপ্যাচ থাকে না। এছাড়াও সম্পাদক আরো একটি মূল্যবান তথ্য এই সূত্রে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজে এমন স্পষ্ট ক'রে না বললে অব্যবসায়ীর পক্ষে অনুমান করা দুরূহ হ'তো। মার্শাল প্ল্যান উদ্ভাবনার দেশ মার্কিনডাঙ্গাতেও যে কবিতা লেখা হয়, জন ক্রো র‍্যানসম, অ্যালেন টেট, ওয়ালেস স্টিভন্স, মারিয়ান মূর প্রভৃতি নাম যে কবিতা লিখেই বিখ্যাত তা নাকি ১৯৪৮ সালের আগে ইংরেজ ছোকরা কবিরা জানতেনই না। অক্সফোর্ডে একদা ডিলান টমাস এর মুখে আবৃত্তি শুনে, এঁদের হঠাৎ চৈতন্য হয় যে স্বদেশীয় আধুনিকতার ইস্কুলে নবীনদের কিছুই আর শেখার নেই, দু-চারটে আদবকায়দা ছাড়া এবং কাজেই তারা স্থির ক'রে ফেললেন যে এবার পাঠ নিতে হবে মার্কিন কবিদের দরবারে।

''জন ওয়েইন-এর ভূমিকা পড়ে অনুমান করা গেলো ইংরেজী ভাষার মাতৃভূমিতে কবিতার বনেদি আসর রুগ্ন বালখিল্যদের বুক ডন-বৈঠকের আখড়াতে পরিণত হয়েছে। বিশ শতকী কাব্যোৎকর্ষের প্রায় সবটুকু ভেট এসেছিলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে থেকে।" এখানে কবি - আলোচক নরেশ গুহর চাপা হাসি জাগানো কয়েকটি শানিত শ্লেষ বাক্য ও শব্দগুচ্ছ তুলে দেওয়া যাচ্ছে :

১। ''...খাস আধুনিকতার যাঁরা সূত্রপাত করেছিলেন, সুদীর্ঘ মানস ভ্রমণান্তে ফ্লোবেরকে যাঁরা অন্বিষ্ট পেনেলোপী ব'লে মেনেছিলেন, তাঁদের কেউ এসেছিলেন আইডাহো-র প্রেইরি থেকে, কেউ বস্টনের ভাটপাড়া থেকে;

২। ''...এঁরা ভূগোলের ঘুরপথ বেয়ে ঘুরতে ঘুররতে সে ডলারের দেশে ফিরেই নিরেট গুরুর সন্ধান পেয়েছেন।"

৩। ''...ইয়েটসকে কেন এর মধ্যে টানা? তিনি তো কদাচ দান্তের আপন ভাষার মাধুরি কিংবা গ্রীস বা চীনা হরফের কারিকুরি সেলাই ক'রে দেননি তাঁর কবিতার পাৎলুনে?"

৪। ''ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ।"

নরেশ গুহ আলোচনা - সমালোচনা - রিভিউ করেছেন — কবিতার ও কবির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেছেন নিজের বোধ - বিশ্বাস - অনুভূতি বিনিয়োগ করে দৃঢ়তার সঙ্গে। কবিতাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব তিনি। তাই যে জন কবিতা নিয়ে ভাবে এবং কবিতার জন্যে কিছু করে সে-জনই তাঁর প্রাণ—তাঁর প্রতিই তিনি প্রণত। তাঁর বা তাঁদের গুণপনার প্রশস্তিসূচক লেখাতেও তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তাও লক্ষ করার মতো। কবিতার প্রতি অগাধ ভালোবাসায় ধ্যানী পরিকল্পক 'সিগনেট প্রেস', 'সিগনেট বুক সপ', 'টুকরো কথা' 'সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা' এবং 'প্রকাশ্যে আধুনিক কবিসম্মেলন' —এর 'প্রথম অনুষ্ঠাতা' দিলীপকুমার গুপ্ত তথা ডি.কে-র প্রতি 'ঋণস্বীকার' করতে গিয়ে তিনি যে গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে আছে শ্রদ্ধাবনত চিত্তের একটা অনাবিল বিমুগ্ধতা। স্মৃতিচারণে আমরা সাধারণত ব্যক্তির গুণপনা বলতে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে অনৃত কথা এবং তাঁর সঙ্গে নিজের কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিলো, তা বলতেই অভ্যস্ত। নরেশ গুহও নিজের সঙ্গে ডি.কে-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের খানিকটা টুকরো কথা বলেছেন, কিন্তু তা নিজেকে সম্প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়, তা বলেছেন ডি.কে.-র বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের অনুসন্ধিৎসু বোধে ধরিয়ে দেবার জন্যে - বলার জন্যে অখ্যাত - অজ্ঞাত কবি ও গদ্যকারদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ডি.কে. কতখানি অকৃপণ ছিলেন, তা বোঝাতে ডি.কে-র কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন :

''সৌভাগ্যবশত অনেকের মতো আমিও তাঁর সম্প্রীতির ভাগ পেয়েছিলুম ব'লে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে পেরেছিলুম তাঁকে। যে কোনো খ্যাতি এবং প্রশস্তি থেকে আত্মগোপন করাই ছিলো তাঁর স্বভাব। কিন্তু তাঁর এই সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদাকে স্বীকার করতে আমরা যদি কৃপণতা করি তার লজ্জা আমাদেরই। একালের সাহিত্য - সুহৃৎদের মধ্যে এতদূর মার্জিত রুচি, উদার, কল্পনাপ্রবণ এবং কৃতী মানুষ দুটি দেখিনি। লোকে জানতো, তিনি ছিলেন বিজ্ঞাপন শিল্পের এক প্রতিভাবান পরিচালক, ছলেন সিগনেট প্রেসের কীর্তিমান প্রকাশ। অথচ সেটুকু বললে তাঁর বিষয়ে কিছুই প্রায় বলা হয় না। তেমনি বড়ো ছিলো তাঁর হৃদয়, তাঁর পরিকল্পনার প্রসার, যেমন তাঁর দেহ ছিলো দীর্ঘ, বলিষ্ঠ এবং বিরাট। তাঁকে দেখে মুহূর্তে গোরার মতো এক স্মরণীয় চরিত্রের বর্ণনা মনে পড়েছিলো আমার যা এই তিরিশ বছরেও ভুলতে পারিনি :... কর্ম-প্রেরণার কেন্দ্রে থেকেও, চারিত্রিক সৌজন্য বশত অন্য সকলের আড়ালে নিজেক অদৃশ্য রাখতে জানতেন বলেই অনেকে আজও বুঝতে পারেননি যে আমাদের কালে সাহিত্য সমেত তবাৎ সংস্কৃতি চর্চা কতো গভীরভাবে ঋণী ছিলো এই মানুষটির কাছে। নিজে তিনি লেখক ছিলেন না, অথচ শুধু খ্যাতনামা প্রকাশকও ছিলেন না। ভুলে গেলে অন্যায় হবে যে, সামগ্রিক ভাবে উৎকৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের স্বপক্ষে রুচিবান বৃহৎ এক পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য দিলীপকুমার গুপ্ত এবং সিগনেট প্রেসের কাছে বাঙালীর ঋণের শেষ নেই।''

একই বাক্যের মধ্যে 'জপ' বিরাম সৃষ্টি করে কথার নানা চাল দিয়েছেন নরেশ গুহ। গোটা প্রবন্ধটাই এ্যাপ্রিসিয়েশন— দিলীপকুমার গুপ্তর ঝুঁকি নেবার অতুলনীয় ক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি, ভালোবাসায় জয় ক'রে অন্যকে দিয়ে আপন রুচিতে দীক্ষিত করে অনুজ বন্ধু ও কর্মিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার শক্তি, নিজের ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের লোকসানের দিকে না-তাকিয়ে প্রায় দুঃসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং তরুণ ও অখ্যাত লেখকদের জনমানসে আলোকিত করার অদম্য প্রয়াস চালানো সক্রিয় উদ্যোগ নেবার একাগ্র ইচ্ছা প্রভৃতির তথ্য সত্যকে একেবারে চাক্ষুস করানোর মতো করে পর প্রজন্মের কাছে দিয়েছেন নরেশ গুহ এবং ভাষাকে করেছেন পরাণ কথা পরিবেশনার মতো ঝরঝরে গদ্যে। তিনি বলেছেন:

''ছোটো দোকান, পরিসরে অভাব, কিন্তু এদের তুল্য পরিচ্ছন্ন, রুচিকর, মনোরম গ্রন্থ বিপণি (সিগনেট বুকশপ) কোথাও আমি দেখিনি। কাউন্টারে দাঁড়ালে ক্রেতার হাঁটু যাতে বাধা না পায় সেই সব অনুপুঙ্খ স্বাচ্ছন্দের কথাও ডি.কে ভেবেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার দোকানে ঐটুকু জায়গার মধ্যে তাঁদের আরামে বসারও ব্যবস্থা হয়েছিলো, দেয়ালে ভাঁজ হয়ে তোলা থাকতো একসার সুশ্রী বেতের চৌকি, জাপানী বা চীনে বুদ্ধির প্রতিফলন ছিলো সেই ব্যবস্থার মধ্যে। দোকানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে এখানে রাখা হতো আর কিছু নয় শুধু সাহিত্যের বই, সাহিত্যের শুধু সেই বাছাই করা বই যাদের সঙ্গে সম্ভাব্য পাঠকের যোগসাধন না-করতে পারলে ডি.কে-র মন থেকে সুখ শান্তি পালিয়ে যেতো। মাসের পর মাস ক্ষতি গুণতে হয়েছে, উৎকর্ষের পরিমাপ নিয়ে একটু আধটু রফা করলেই যে ক্ষতি হয়তো বা রদ করা যেতো, তিনি করেননি। আইডিয়ার সঙ্গে রফা করা তাঁর ধাতে ছিলো না।''

এবারে গঙ্গা জলেই গঙ্গাপূজা করা যাক। নরেশ গুহ অবনীন্দ্রনাথের ওপর বলতে গিয়ে যা বলেছেন, আমরা সেই বাক্যটাকেই বলতে চাই নরেশ গুহ প্রসঙ্গে : ''রচনার ভঙ্গিতে শুধু নয়, বিষয়ের জাদুকরী রূপান্তরেও তিনি মূল কবি। বিষয়ে কবিত্ব থাকে না, কবিত্ব বিষয়ীতে।'' কবি - আলোচক নরেশ গুহ, বিষয় যেমনই হোক না কেন, তাঁর কবিত্ব দিয়ে রসকষহীন নিরেট বিষয়কেও স্বাদু করে তুলছেন আর তার প্রমাণ 'আধুনিক বাংলা ভেরিওরাম : রবীন্দ্রনাথ' নামের প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে এক একটি বাক্য হয়েছে এক সঙ্গে বহুঅর্থে ভরা দীর্ঘ এবং যৌগিক। কথার টুকরোগুলো ছেটেকেটে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে কবিত্বের আঠা দিয়ে। 'গ্রন্থ সম্পাদনা যে একটা কাজের মতো কাজ' একটা পাঠক সমাজকে বোঝাতে, তিনি লিখেছেন : 'আমরা যে ধরেই নিয়েছিলাম, পঞ্চানন কর্মকারের হাতে বাংলা হরফ ঢালাই হবার পূর্বেকার যে বাংলা সাহিত্য কীটভুক্ত পুঁথি ঘেঁটে কষ্টে - সৃষ্টি উদ্ধার করতে হয়, কিংবা যে সব লেখার পাঠ কারো - না - কারো প্রমাদবশত পুঁথি ভেদে পৃথক, অতএব যে-সব ক্ষেত্রে আদি রচয়িতার স্বকীয় উদ্দেশ্য বিষয়েই আমরা সন্দিহান, সম্পাদকগণ সম্ভবত সেই সব ক্ষেত্রেই আমাদের সম্ভাব্য সুহৃদ। এরা শিল্পী না - হতে পারেন, কিন্তু শিল্পের সহায়। আহত বা অঙ্গহীন প্রাক্তন কাব্যের শুশ্রুষাকারী তাঁরা, লিপিবদ্ধ রচনার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে তাঁরা কৃত সংকল্প। তাই তাঁরা, আমরা হয়ত ভাবতাম, আমাদের, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে যাঁদের পথ্য তাঁদের, নমস্য। অবশ্য ব্যক্তিভেদে, শক্তিভেদে প্রস্তাবিত নিদান সচরাচর অবিকল হয় না ব'লেই দ্বিতীয় আর -এক দফা সম্পাদকীয় কর্মের আবশ্যকতা দেখা দেয় যে-কাজ হ'লো পূর্বমীমাংসাবলীর বিচারপূর্বক একত্র সন্নিবেশ করা - যা থেকে অপরে উপকৃত হ'তে পারেন। এই যে 'এডিসিও কুম্ নোটিস্ ভারিওরুম্' -এই যে বহুজনকৃত পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ, তাকেই যে সংক্ষেপে বলে 'ভেরিওরাম', তাও জানা ছিল বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে আমরা হয়তো ভেবে নিয়েছিলুম, এ কর্মের অনন্য উদ্দেশ্য পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধার। কিন্তু লেখক যে-ক্ষেত্রে সাবেক না -হ'য়ে নিতান্ত এ-কালের শরিক, ক্রমোৎকর্ষপ্রবণ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় যাঁর একই রচনাবলীকে অবলম্বন বা উপলক্ষ ক'রে গবেষকবৃন্দের ঘর্মোৎপাদিকাশক্তি নিয়ত ক্রিয়াশীল, তাঁরও কৃতকর্মের অঙ্গ সম্পাদনা যে নিতান্ত সাহিত্যিক কারণেই অবশ্যকৃত্য, এ বিষয়ে সত্যি আমরা সচেতন ছিলুম কিনা সন্দেহ। পুলিনবিহারী সেন এবং তাঁর যোগ্য সহকর্মী শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় তাই রবীন্দ্রনাথের মতো ঘোর একেলে একজন জাগ্রত লেখকের ভেরিওরাম সম্পাদনার সূত্রপাত ক'রে আমাদের চমৎকৃত ক'রে দিয়েছেন।''

—স্বাভাবিক কারণেই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো। না হ'লে অন্য প্রবন্ধের চেয়ে এ প্রবন্ধের গদ্যের চাল-এর কোথায় পার্থক্য, তা ধরা হয়তো একটু শক্ত হোতো। এ প্রবন্ধ লেখক সেন-মুখোপাধ্যায়ের কাজটির অঢেল প্রশংসা করেও জানিয়েছেন আরো ভালো কী হ'লো হ'তে পারতো। এ বিষয়ে লেখক কিছু পরামর্শও রেখেছেন সবিনয়ে।

কবি নরেশ গুহ মেধা ও মনকে একাসনে বসিয়ে যে অসাধারণ গদ্য রচনারও শিল্পী তার পরিচয় আছে 'একালের জন্য মহাভারত' নামের প্রবন্ধের মধ্যে। এটা মামুলী বুক রিভিউ নয়। বিষয় চাপিয়ে বিষয়ীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবনত চিত্ত যে ভালোবাসার সুতাতন্তু বুনেছে, তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা যায়, হাতের কাছে আমরা শ্রদ্ধেয় গুহ-র যে গদ্য রচনাগুলো — অর্থাৎ প্রবন্ধ - নিবন্ধ আলোচনা - সমালোচনা - বুক রিভিউ বা পুস্তক পর্যালোচনাদি পেয়েছি, তা তিনি যেমন বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে বলেছেন,

আমরাও তাঁর সম্পর্কে সেই একই কথা বলতে পারি, এ লেখাটিকে 'তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে ... কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।'

মহাভারত নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র - রাজশেখর বসু প্রমুখ ধীমানরা যেমন ভেবেছেন — যেমন ওই সমুদ্র সমান মহাকাব্যের অযথা - ফেনা বর্জন করে সেই মুক্তোটি ঝিনুক ভেঙে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, পর্যালোচনা করে, তেমনি বুদ্ধদেব বসুও আবিষ্কার করেছেন মহাভারতের প্রকৃত নায়ককে —যুধিষ্ঠিরকে। মহাভারত তাঁকে ভাবিয়েছে দীর্ঘ দিন ধ'রে। ''বুদ্ধদেব বসুর জীবনের শেষ দশ বছরের কাব্য - নাটক সমূহে সেইসব (মহাভারতীয় উপাদান) উপকরণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সকলেরই চোখে পড়বে।'' শ্রদ্ধেয় গুহ জানিয়েছেন, ''তাঁর রচনাবলীতে এই পর্বের সূচনা হয়েছিলো সেই সময় থেকে যখন নবগঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার একটি বিশিষ্ট বিভাগ।''

বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে নরেশ গুহ মশাই বু.ব-র কবি মানস ও সাহিত্য নিয়ে প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে ও পরের সঙ্গে সংগ্রামের পরিচয় উত্থাপন করেছেন। অতি কাছের থেকে তিনি আধুনিক কবিদের কাছে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য প্রেমী প্রাণটিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন ব'লে তাঁর 'মহাভারতের কথা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষ বুদ্ধদেব বসুর দুঃখ - সুখ - সাধনার কথা — তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির কথাও উত্থাপন করেছেন। এবং জানিয়েছেন : 'ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা সত্ত্বেও ব্যাসদেব কৃত সেই বিশাল আকর গ্রন্থটি কীভাবে পাঠ করলে একালের হৃদয়মনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী এবং উপকারী হ'তে পারে তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে বুদ্ধদেবের রচনায়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত এই আলোচ্য গ্রন্থটি মূল মহাভারতের অন্তর্গত কিছু মিথলজির উপরে নির্ভরশীল, যাকে বুদ্ধদেব বসু 'পুরাণকথা' অভিধায় বিশেষিত করেছেন।'' আলোচক গুহ এ প্রসঙ্গে বু. ব-র অভিপ্রায়টিকেও তাঁরই ভাষায় পরিবেশন করেছেন : ''আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে-সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সব চেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালের যা বিশ্বাস করতেন), আমি সেগুলিকে অবাস্তব ব'লে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেই সব বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার অনুসন্ধান করেছি। ... আমি দেখাতে চেয়েছি যে মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান। এই কথাটা অবশ্য ভারতবাসীর অজানা নয়, তবু নতুন ক'রে বলারও প্রয়োজন আছে।''

এখানে সমালোচনার সমালোচনা নয়, তার অবকাশও নেই। সমালোচনা করতে গিয়ে কবি নরেশ গুহ বিভিন্ন প্রবন্ধে যে গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন তারই কিচুটা নমুনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। আমরা বলেছি 'মহাভারতের কথা'-র সমালোচনাবলি কি রসগ্রাহী আলোচনা বলি, এই রচনাটির গদ্যই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। এতে একই সঙ্গে 'মহাভারতের কথা' ও তার লেখকের মহিমা একযোগে সম্ভ্রম-সুন্দর-গম্ভীর ভাষায় পরিবেশন করে বুদ্ধদেব বসু যে মহাভারতের নায়ক ব্যাপারে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, তা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় সমর্থন করেছেন।

''যুধিষ্ঠিরের এই নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি খুব সহজ নয়। আমাদের মনে পড়ে যায় যে যোদ্ধা হিশেবে তিনি কাহিনীর মধ্যে নগণ্যতম বীর, প্রণয় ব্যাপারেও অর্জুনের অতি অযোগ্য তিনি। হয়তো তিনি ভীমের মতো নির্দয় নন, কিন্তু কোনো সাধারণ জুয়াড়ির মতোই তাঁর দ্যুতাসক্তি আমাদের বিচলিত করে। অথচ আশ্চর্য এই যে পর্বের পর পর্ব পাঠ করতে করতে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধের কিছু মাত্র হ্রাস হয়না, আমরা বরং নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি কীভাবে ধীরে - ধীরে তাঁর নৈতিক সত্তার উন্মীলন ও বিকাশ হচ্ছে।...বুদ্ধদেব আমাদের ভুলতে দেন না যে, বেদে এই মহাত্মার কোনো প্রকৃত আস্থা নেই, অপারগ তিনি সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পবিত্র শাস্ত্রের অনুগামী হতে। অথচ ধর্মবকরূপে বনপর্বে উপস্থিত তাঁর পিতার, সেই সংশয়াচ্ছন্ন, মিলনপ্রয়াসী, রহস্যময় দেবতাটির অনুমোদিত সংযম ও শান্তিতে পৌঁছনোর শিক্ষাটি আয়ত্ত করতে তাঁকে জীবনের বহু দুঃখ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো। দ্বন্দ্বময় জীবনের দাবি মানতে বাধ্য তিনি, কেননা সংসারী মানুষ হিশেবে ঘটনাজাল উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তবুও কীভাবে এই জটিল জাল অবশেষে তিনি ছিন্ন করতে পেরেছিলেন তারই অনুসন্ধানে 'মহাভারতের কথা'র বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হয়েছে।''

আলোচক নরেশ গুহ 'মহাভারতের কথা' -কে এমন সশ্রদ্ধভাষায় আলোচনা করেছেন এবং আলোচনায় এমন মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যে, এ রচনার পাঠক বু.ব-র গ্রন্থটি তো বটেই — মূল ব্যাস - মহাভারত পাঠের জন্যেও উন্মুখ হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধ -নিবন্ধ -বুক রিভিউ-শোক জনিত স্মৃতি রোমন্থনাদির মধ্যে ব্যবহৃত গদ্য দেখে কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের গদ্যশৈলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব। এখানে আমরা শুধু দেখাতে চেষ্টা করেছি শব্দের ওপরে কতখানি কর্তৃত্ব থাকলে একজন লেখক বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে দিয়ে কী জাতের এবং কী দাতের প্রতিমা রচনা করতে পারেন। আমরা কবি নরেশ গুহর যে-কটি রচনার মধ্যে দিয়ে যেতে পেরেছি, তাতে দেখেছি, রচনাগুলোতে সুখের কথা আছে, আছে দুঃখের কথা, আনন্দের কথা আছে, আছে মৃত্যুজনিত শোক ব্যথার কথা, আছে সম্ভ্রম প্রকাশ। আছে কটু - কষায় কথা, আছে বিরক্তি, আছে ব্যঙ্গ - বিদ্রুপও - লঘু - গুরু - গম্ভীর - বৈদগ্ধ্য প্রকাশন কথা যেমন আছে, তেমনি আছে মরমী উপলব্ধির অনুরণনন। অনেক দেশি - বিদেশি লেখকের নাম এবং লেখকদের উপযুক্ত রচনার উদ্ধৃতি আছে যা তাঁর অতি পাঠক্রিয়া এবং উপলব্ধির বিশালতা ও বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রকাশ কিন্তু রচনাকে কন্টকিত করেছে বলে মনে করায় না, বরং বক্তব্যকে প্রামান্য ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। কোথাও অহমিকা প্রকাশের চিহ্নমাত্র ধরা পড়ে না কোনো রচনায়। আমাদের বিশ্বাস, একজন লেখকের কৃতিত্ব সেখানেই, যেখানে তিনি তাঁর লেখা পাঠকালে পাঠককে সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করাতে পারেন, লেখক যেভাবে যা বলেছেন, তার আর অন্যথা হয়না; আর তাঁর রচনাশৈলী তরতর করে পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে পারে রচনার শেষ ছেদচিহ্ন পর্যন্ত এবং ভাবাতে পারেন তাঁর বক্তব্য বিষয়ে। কম কথা নয়, বর্তমান লেখক কবি নরেশ গুহর নানা ফুলের একতোড়া রচনা মাথাকে ক্লান্ত না-করেই পড়ে গেছেন এবং 'অন্তরালে'-র যেটুকু 'ধ্বনি - প্রতিধ্বনি' ধরতে পেরেছেন, প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।